Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual-Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-1 July 2024

‘সবুজ পত্রে’র রবীন্দ্রনাথ

অশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2024/08/3_Ashokkrrishna-chattopadhaya.pdf

সারসংক্ষেপ: প্রমথ চৌধুরীর ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকা ছিল রবীন্দ্রময়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই পত্রিকার প্রধান লেখক, প্রধান আকর্ষণ, প্রধান পরামর্শদাতা। লেখক রবীন্দ্রনাথকে না পেলে ‘সবুজ পত্র’কে বাঁচানো যাবে না, বারবার এই অসহায়তা সম্পাদকের স্বরে ফুটে উঠেছে। অসহায়তা না বলে অবলম্বন বলাই ভালো। পত্রিকার জন্মলগ্ন থেকে পত্রিকার শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ পত্রিকার সঙ্গে আন্তরিকভাবে জড়িত ছিলেন। এই লেখায় সময়ের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কীভাবে রবীন্দ্র রচনাগুলি ‘সবুজ পত্র’কে ঋদ্ধ করেছিল তা দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক আলোচনা-সমালোচনা কীভাবে ‘সবুজ পত্র’এর পাতায় স্থান পেয়েছিল।

সূচক শব্দ: যৌবন বন্দনা, মুক্তক, চলিত ভাষা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা ভাবনা, কথিকা, গীতি গদ্য

‘সবুজ পত্র’ প্রথম প্রকাশ হয়েছিল ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭মে, ১৯১৪), সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসকেই বেছে নিয়েছিলেন পত্রিকা-প্রকাশের দিন হিসেবে। ১৩২১ থেকে ১৩২৯ এর আষাঢ় পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে ১৩৩২এর শ্রাবণ পর্যন্ত বন্ধ ছিল পত্রিকা। আবার ভাদ্র ১৩৩২ থেকে ভাদ্র ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় ‘সবুজ পত্র’। মোট ১০৬ সংখ্যার ‘সবুজ পত্র’এ ৬৩টিতে ছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা। মোট লেখার সংখ্যা ১২৫। এমন অনেক সংখ্যা ছিল যেখানে সম্পাদকীয় বা দুয়েকটা লেখা বাদ দিলে সব লেখাই রবীন্দ্রনাথের। সম্পাদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো ছিলই, তা ছাড়া এই পত্রিকার সঙ্গে মনের টানও খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই ‘সবুজ পত্র’ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রময়। আক্ষরিক-অর্থেই এই পত্রিকার প্রদীপ-প্রজ্বলনের আগে সলতে-প্রস্তুত থেকেই যুক্ত ছিলেন তিনি। ‘সবুজ পত্র’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের অবদান যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি রবীন্দ্রসাহিত্য জগতে ‘সবুজ পত্র’র অবদানও স্বীকার করে নিতে হয়। এই স্বীকৃতি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং:

“আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে ‘সবুজপত্র’ বাহকতায় আমি তার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনার একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোন পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হইনি।”[১]

প্রমথ চৌধুরী তাঁর আত্মকথাতেও জানিয়েছেন, ‘সবুজ পত্র’ প্রকাশের আদ্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখায় যে এই-সাময়িক-বীতরাগের কথা বলেছিলেন, প্রমথর লেখায় তাঁর সমর্থন আছে:

“... কমলালয় বাড়িতে সবুজপত্রের উদ্‌গম হয়, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই।... এই বোটেতেই মণিলালের কাছে শুনি যে, রবীন্দ্রনাথ বলেন যে আর লিখবেন না, তিনি ঢের লিখেছেন। তা শুনে আমি তাকে বলি যে, বহু লোক আপনার বয়সে কেবল লিখতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বার করে, তা হলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বললুম, আপনি যদি লেখেন তা হলে আমিও কাগজ বার করতে রাজি আছি। তিন বললেন অন্য কোন কাগজে আমি লিখব না।”[২]

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়'এর প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত পত্রপ্রবন্ধে এই ভাবনার সমর্থন পাই।[৩]

রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বভাবতই অন্য কোনো কাগজে লিখবেন না'র মতো প্রতিজ্ঞারক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'সবুজ পত্র'এর জন্মের আগে থেকেই প্রমথ-রবীন্দ্র সম্পর্কের আরেক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়, 'সবুজ পত্র'কে কেন্দ্র করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 'সবুজ পত্র' উদগমের আগে থেকেই তিনি এর সঙ্গে ছিলেন, দুইজনের লিখিত সাক্ষ্য থেকেই পাওয়া যায়। অবনীনন্দ্র-জামাতা মণিলালের একটা কাগজ 'সবুজ পত্র' নামে বের হবে তা ঠিক হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে প্রকাশিত এই কাগজের নাম প্রমথ চৌধুরীর দেওয়া হলেও নাম নিয়ে ভাবনাচিন্তা ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজেরও। তিনি 'সবুজ পত্র' প্রকাশের আগে এই কাগজটির একটি নাম প্রস্তাব করেছিলেন 'কনিষ্ঠ'। "আকারে ছোট — বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, সাবের হিসাবে।"[৪] সেই সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে কাজ শুরু করার তাগিদ ছিল বারবার। সঙ্গে আশ্বাস, তিনি একটু ফাঁক পেলেই লিখতে শুরু করবেন। প্রথমে প্রস্তাব ছিল পত্রিকা প্রকাশ হবে ১৫ বৈশাখ।[৫] তার জন্য নিজের লেখা দেবার পাশাপাশি আগামী কয়েকমাসের সম্বল নিয়েও তাঁর ভাবনা ছিল।[৬] নাটোররাজ 'মানসী' পরিচালনায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁর সাহচর্য 'সবুজ পত্র' পাবে না।[৭] এসব বিষয় নিয়েও তাঁর চিন্তা কম ছিল না।

তারপর 'সবুজ পত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখায় ভরে উঠতে লাগলো সবুজ পাতাগুলি। প্রমথ চৌধুরী, তাঁর বীরবল সত্তা নিয়ে (এবং ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র নামেও লেখেন) ফিল্ম 'সবুজ পত্র'এর সর্বাধিক লেখার লেখকক, তারপরেই রবীন্দ্রনাথ। সম্পাদকের ভাষায় —

"লেখবার মধ্যে আমিই নিয়মিত মাসে মাসে সবুজ পত্রে লিখতুম। আর রবীন্দ্রনাথ বোটে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। তার লেখা অঙ্গীকার না-করে সবুজ পত্রের কোন সংখ্যায় বেরোয়নি। এবং তারই সাহচর্য না পেলে আমি যে ছয় মাসও সবুজপত্র চালাতে পারতুম না, সে কথা বলাই বাহুল্য।"[৮]

'সবুজ পত্র'এর প্রথম বছর আর রবীন্দ্রনাথ

'সবুজ পত্র'এর প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়। 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি ১৫ বৈশাখে 'সবুজ পত্র'এর কথা ভেবেই লেখা হয়। জীর্ণ, পুরাতনকে সরিয়ে যৌবনে রাজটীকা দেওয়ার এই কবিতার সুর 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধেও দেখতে পাই। 'বিধাতার সৃষ্টি পাখা নূতন, আর কামারের সৃষ্টি খাঁচা সনাতন; অতএব ঐ খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখাঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, আর তাহার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ। আমাদের সামাজিক কামারে যে শলাটি যেমন করিয়া বানাইয়াছে শিশুকাল হইতে তাহারই স্তবের বুলি পড়িয়া পড়িয়া আমরা অন্য সকল গান ভুলিয়াছি' ('বিবেচনা ও অবিবেচনা', পৃ. ২৩, 'সবুজ পত্র', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা)।

এই অচলায়তনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-নির্ঘোষ আমরা তাঁর বহু রচনাতেই পাই এবং 'সবুজ পত্র'এ এই যৌবনবন্দনা যথাযথ বিকশিত হয়েছিল। রবীন্দ্র-উদ্দেশ্যও ছিল তাই। 'প্রবাসী'তে লেখা দিতে পারছেন না বলে প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অনুযোগের উত্তরে তিনি তাঁর রচনা-বিরলতার উল্লেখ করেও এই উদ্দেশ্যের কথা বলেন — "আমার মুস্কিল এই যে সবুজ পত্রে ঢাকা পড়িয়াছি।' এই ঢাকা পড়ার কারণ হিসেবে তিনি জানান আত্মীয়ের কাগজ বলেই শুধু নয়। 'সবুজ পত্র'এর এক বিশেষ ভাবের আকৃতি ও প্রকৃতি যা দেশের পাঠকের মনকে ধাক্কা দিয়ে বিচলিত করতে পারে তাতে সামিল হওয়া তিনি কর্তব্য মনে করেছিলেন। 'মনে মনে ঠিক করিয়াছি আর একটা বছর সাহিত্যক্ষেত্রে কাজ করিয়া অবসর লইব। এই বৎসরে দেশের যৌবনকে যদি উদ্বোধিত করিতে পারি তবে আমার বৃদ্ধ বয়সের কর্তব্য সমাধা হইবে বলিয়া মনে করি।"[৯]

১৩১৮এর পৌষে 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'পণরক্ষা' গল্পের প্রায় আটাশ মাস পর লিখলেন 'হালদার-গোষ্ঠী' গল্প, প্রকাশিত হয় 'সবুজ পত্র'এর এই সংখ্যাতেই। বনোয়ারি কেন্দ্রিক এই গল্পে হালদার-গোষ্ঠীর সনাতন স্রোতের বিপরীতে বনোয়ারিও একলা চলার গায়ক। 'সবুজ পত্র'এর দ্বিতীয় সংখ্যায় বাংলা ছন্দ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জে.ডি. এণ্ডার্সনকে লেখা পত্র থেকে এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়। দীর্ঘ প্রবন্ধটি ছন্দ আলোচনাতেও সাধু-চলিতের আলোচনা এনেছেন। সেখানে প্রসঙ্গক্রমে সাধুভাষার সাহিত্যে প্রচলিত ছন্দগুলি গানের সুরে কীর্তিত হতো বলে এই তানপ্রধান ছন্দের সাহায্যে কীভাবে শব্দের ক্ষীণতা ও ছন্দের ফাঁক ভরে দেওয়া যায় তার আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবেই শোষণশক্তির

উদাহরণ এসেছে। এসেছে 'মানসী'তে যুক্তবর্ণকে দুইমাত্রা ধরার পূর্বদৃষ্টান্ত। 'আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছি।'(পৃ. ১৪, 'সবুজ পত্র', জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) অর্থাৎ চলতিভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন রবীন্দ্ররচনার ধারা মেনেই প্রবাহিত হতো। 'সবুজ পত্র' তা পরিপুষ্টিতে সহায়তা করেছে।

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'আমরা চলি সমুখ পানে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি 'সবুজের অভিযান'এর ভাবের অনুসারী। রবীন্দ্র-গল্পের যে পুনর্গতি শুরু হয়েছিল প্রথম সংখ্যায়, সেই ধারাবাহিকতাকেই পেয়ে যাই হৈমন্তী গল্প। পুরুষ-কথকের উত্তমপুরুষের বাচনের মধ্যেও এ গল্প হয়ে ওঠে এক নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হওয়ার ট্র্যাজিক গল্প।

আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা 'শঙ্খ' ও 'যৌবনেরি পরশমণি করাও তবে স্পর্শ' এই আহ্বানকে দ্যোতিত করে। আষাঢ় সংখ্যায় 'আষাঢ়' বলে একটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদককে লেখেন, 'তুমি তাতে প্রাচীন ভারতের যে ধরণের ছবি চেয়েছ তা হয়নি কিন্তু ওর মধ্যে পূবের হাওয়াটা আছে।' আর লেখেন 'বোষ্টমী' গল্প। বাস্তবে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের ছবি গল্পের কথক চরিত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। তাঁর পরিচিত সর্বক্ষেপি চরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে বোষ্টমী চরিত্রে। শুরুতে কথক-বোষ্টমীর আলাপন থেকে গল্প বদলে গেছে বোষ্টমীর কথনে। গল্পের মধ্যে গল্প এবং দুই কথকের গল্প-কথনের প্রবণতা আমরা মূলত রবীন্দ্র-অতিপ্রাকৃত গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছি।

শ্রাবণ সংখ্যার 'সর্বনেশে' কবিতায় আগের মতো যৌবনরাগের ছটা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত এই কবিতাগুলি পরে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম থিম ছিল এই সবুজের অভিযানকে স্বীকৃতি দিয়ে যৌবনবন্দনা। জীবন-মৃত্যু, রূপ-অরূপ, সীমা-অসীম, খণ্ড-অখণ্ড, পূর্ণ-অপূর্ণের মতো গতি-স্থিতি এই কবিতাগুলির অঙ্গ হয়েছে। ফরাসি দার্শনিক বেঁগসর গতি তত্ত্বের অনুপ্রেরণায় গতিবাদ এই কবিতাগুলিতে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ গতির সঙ্গে স্থিতির বিপরীত যুগ্মকের আততি ব্যবহার করেছেন। উপনিষদের প্রভাব এক্ষেত্রে তাঁর কবিতাগুলিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। আর বলাকাপর্বের অনেক কবিতাতে মুক্তক ছন্দের প্রয়োগ রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহে শুধু নয় বাংলাকাব্য ক্ষেত্রেও নতুন বাঁক। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি পত্রের আকারে লেখা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম চলিত ভাষায় লেখা গল্প। নারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চরম দিকটি এই গল্পে ফুটে উঠেছে। হৈমন্তী, নিরুপমার প্রতিবাদ একরকম নীরবে আত্মবিনাশের প্রতিবাদ। চন্দরাও স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নিয়েছে। বোষ্টমী ঘর ছেড়ে এসেছে এবং মৃণালের ঘর ছেড়ে আসা সরব প্রতিবাদের মধ্যে। এই গল্প রক্ষণশীলদের নাড়িয়ে দিয়েছিল বলেই প্রতিপক্ষ নারায়ণী সেনা বিপিনচন্দ্র পাল অগ্রহায়ণের নারায়ণে ব্যঙ্গ করে লেখেন 'মৃণালের কথা'। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালেরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাস্তবতাহীন বলে যে আক্রমণ শুরু করেছিলেন, এই সংখ্যায় 'বাস্তব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তর দেন। যদিও দুর্বল প্রতিপক্ষদের ব্যক্তিগত আক্রমণের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে তিনি সাহিত্য বাস্তবতা নিয়ে সাহিত্যতত্ত্বের মূল্যবান আলোচনা করেছেন, যা পরে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে স্থান পায়। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পর এন্ড্রার্সনকে লেখা চিঠিতে আবার ছন্দালোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সেখানে তুলনামূলক ছন্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন 'আমাদের সমাজ লোক-সাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এখানেই সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে এইখানেই মানুষের পতন।' বাংলার সেইসময়ের সামাজিক পরিস্থিতি, নিম্নবর্গের উপর উচ্চবর্গের ক্ষমতাচাপের ফলে দেশের অধোগতি, বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এইসব নিয়ে বিশ্লেষণী লেখা 'লোকহিত' প্রবন্ধ ভাদ্র সংখ্যায় বের হয়। 'বলাকা'পর্বের কবিতা 'পাড়ি' প্রকাশিত হয় এই সংখ্যায়। বিশ্বসমরের দামামা বেজে উঠেছিল তার সম্পর্কে সমাজ-সচেতন কবির দৃষ্টিভঙ্গি কবিতায় পাই। এই সংখ্যায় সাধুভাষাতে উত্তমপুরুষের কথনে লেখা 'ভাইফোঁটা' গল্পে কথকের পতন ও প্রায়শ্চিত্তের ট্র্যাজিক কাহিনি লেখেন। বিজ্ঞান দিয়ে নয়, তত্ত্ব দিয়েও নয় নিজস্ব হৃদয়মনের তারে বেজে উঠা বিশ্বসঙ্গীতকে অনুভব করে গড়ে ওঠে 'আমার জগৎ', আশ্বিন সংখ্যায় এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধটি স্থান পায়। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতটা উচ্চভাব পোষণ করতেন এবং প্রকৃত সমালোচনাকে মেনে নিতেও তাঁর যে কষ্ট ছিল না তা বোঝা যায় সম্পাদককে লেখা চিঠি থেকে।

''আমি 'আমার জগৎ' নামক একটা লেখা লিখে ভয়ে ভয়ে মণিলালের কাছে পাঠিয়েছি। ভয়ের কারণ এই, এরকম তত্ত্ব

আলোচনা আমার অধিকারের মধ্যে নয়। পাছে আমার নামের জোরে তোমরা ওটাকে তরিয়ে দিতে চাও সেইজন্যে মণিলালকে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছি যদি সেটা পড়বার সময় তোমার মুখে কোনোপ্রকার সম্পাদকী বিকার দেখা দেয় তা হলে ওটাকে ফস্ করে সরিয়ে নিতে।"[১১] এই সংখ্যাতেই লিখেছিলেন পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত (একারণেই পাণ্ডুলিপিতে নাম ছিল 'পাঁচ রাত্রি') 'শেষের রাত্রি' গল্প। সংলাপকেই প্রাধান্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই গল্প। প্রতিবাদী আধুনিক নারীদের ছবি আঁকতে আঁকতে রবীন্দ্রনাথ এখানে ফিরে গেছেন শ্বাশত মাতৃসত্তায়, প্রধান হয়েছে প্রাচীনা, মাতৃসমা মাসি চরিত্র। মৃত্যুপথযাত্রী যতীনকে স্ত্রীর ঔদাসীন্যর বিপরীতে মাসি মাতৃস্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে, স্ত্রীর অবহেলাকে মনোরম মিথ্যে দিয়ে আড়াল করে রেখেছে।

কার্তিক সংখ্যাতেই ফিরে পেলাম প্রতিবাদী নারীমুখ, পেলাম কল্যাণীকে 'অপরিচিতা' গল্পে। 'প্রবাসী'র কার্তিক সংখ্যায় অনেকগুলি লেখা 'শরতের গান' নামে প্রকাশিত হয় যা পরে 'গীতালি' কাব্যগ্রন্থে স্থান পায়। এর রেশ 'সবুজ পত্র'এর এই সংখ্যাতেও ছিল, এই সংখ্যার দুটি কবিতা 'সন্ধ্যার যাত্রী' ও 'শেষ প্রণাম' রচনাদুটিও 'গীতালি'তে স্থান পায়।

অগ্রহায়ণে পত্রিকায় 'ছবি' আর 'তাজমহল' কবিতা দুটি স্থান পায়। আগের অনেকগুলি কবিতা 'বলাকা'তে পরে স্থান পেলেও 'ছবি' থেকেই শুরু হলো পয়ারের বেড়াভাঙা বলাকার ছন্দ মুক্তকের প্রয়োগ। দুটি কবিতাই 'বলাকা' পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। 'চতুরঙ্গ'র প্রথম অংশ 'জ্যাঠামশাই' এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। "কোনো মতে টুকরো সময়গুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে ফকিরের কাঁথার মত করে।"[১২] এই লেখাকে গল্প বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পরে পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় যথাক্রমে 'শচীশ', 'দামিনী' আর 'শ্রীবিলাস' লিখলেন, সম্পূর্ণ হলো 'চতুরঙ্গ'। মূলত শ্রীবিলাসের বাচন ও দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন উপন্যাসটিতে (শচীশের ডায়ারি বা ননীবালার চিঠি এইসব অংশ বাদ দিলে)। এই সংখ্যাতেই আঁদ্রে গীদ্ ফরাসীতে 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করে যে ভূমিকা লিখেছিলেন, সেই ভূমিকা অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী। 'রবীন্দ্রনাথের গীত ইউরোপের মনের কোন তার স্পর্শ করেছে' ('সবুজ পত্র', অগ্রহায়ণ, ১৩২১, পৃ. ৫৭৪) তা এদেশের পাঠককে জানাবার উদ্দেশ্যেই এই অনুবাদ। অর্থাৎ 'সবুজ পত্র' তাদের রচনাসম্ভারে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনাকেও গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই যুদ্ধ নিয়ে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রমথ চৌধুরী 'বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ' নামে যে লেখা লেখেন তার সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ পৌষ সংখ্যায় লেখেন 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধ। মুক্তক-চর্চার পথ ধরে এই সংখ্যায় দিয়েছেন 'চঞ্চলা' ও 'তাজমহল' নামে দুটি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তখনো এই বিষয়ে দ্বিধাহীন হননি তাই প্রমথ চৌধুরীকে বলেন কবিতাটি পছন্দ না হলে বাদ দিতে যেন দ্বিধা না করেন। 'চতুরঙ্গ'এর 'শচীশ' অংশ স্থান পায় এই সংখ্যাতেই তা আমরা আগেই দেখেছি। এই সংখ্যায় একটি বাদে সব লেখাই রবীন্দ্রনাথের। খ্রিস্ট-জন্মদিনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে কথিত বক্তব্য তিনি 'সবুজ পত্র'কে দেন। সেটিও এই সংখ্যায় 'খৃষ্টধর্ম' নামে প্রকাশিত হয়। অসাম্প্রদায়িক রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনায় বিশ্বমানবতাবাদ এই প্রবন্ধের অন্যতম উপজীব্য।

মাঘ সংখ্যায় 'দামিনী' অংশ এবং 'উপহার' ও 'বিচার' নামে 'বলাকা'পর্বের দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রাবণ সংখ্যায় লেখা 'বাস্তব' প্রবন্ধের বিরুদ্ধে এই সংখ্যায় কলম ধরেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্র'এ রবীন্দ্র-বিরোধী লেখা ছাপতে দ্বিধায় ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে এই লেখা ছাপতে বলেন। অবশ্য 'সাহিত্যে বাস্তবতা' নামের এই প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সংখ্যাতেই কলম ধরেন স্বয়ং সম্পাদক 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' প্রবন্ধ লিখে। 'শ্রীবিলাস' অংশের সঙ্গে ফাল্গুন সংখ্যায় বের হয় 'দুই নারী', 'এবার' আর 'আবার' বলে তিনটি কবিতা।[১৩] ফাল্গুন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা দেন তার সারমর্মও এই সংখ্যায় 'কর্মযজ্ঞ' নামে প্রকাশিত হয়। লেখাটি পরে 'কালান্তর' গ্রন্থে স্থান পায়। প্রথম বছরের শেষ সংখ্যা অর্থাৎ চৈত্র সংখ্যা জুড়ে ছিল কবির নাটক 'ফাল্গুনী'। তার আগে বসন্তের পালা অংশটি পাই, কতকগুলি গানের সমাহার। লেখকের মতে, 'এই গানগুলি তম্বুরার মত তাহারি ['ফাল্গুনী' নাটকের] মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে।' 'ফাল্গুনী' নাটকটিতে যৌবনবন্দনা বা 'বলাকা'র গতিবাদের মূল সুরটি লক্ষ করা যায়। মাথায় রাখতে হবে, লেখার সময় এটির পূর্বনাম ছিল 'বসন্তোৎসব'। বছর শেষের হিসেবনিকেশ করলে দেখা যাবে একটি পুরো নাটক, 'চতুরঙ্গ', প্রথম আটসংখ্যায় আটটি গল্প, বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ আর অনেকগুলি কবিতা নিয়ে প্রথম বছরের 'সবুজ পত্র' জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীকে ২৮ জুলাই, ১৯১৪এ এক পত্র লেখেন,

"সবুজ পত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব কথা লেখে তবে লোকে বলবে কী? একে তো সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকবে তারপরে হয়তো বৈচিত্রের অভাবে দুঃখবোধ করতে পারে।"[১৪] এই সময় এই ভাবনা স্বয়ং সম্পাদকেরও ছিল, তাই শ্রাবণ, ১৩২১এ 'বীরবল'এর পত্রতে তাঁর নিজেরও আশঙ্কা ছিল সম্পাদক ও প্রধান লেখক ছাড়া 'নূতন লেখক চাই, নচেৎ সবুজ পত্র কালক্রমে শ্বেতপত্রে পরিণত হবে।' (শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩২১, পৃ. ২৬৩) এই সময় রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্র'কে একদিকে যেমন অকৃপণ হাতে লেখা দিয়ে সাজিয়েছেন, তেমনি পরামর্শদাতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এই সময়ের সম্পাদককে লেখা চিঠিগুলি পড়লেও দেখা যায়, তিনি সম্পাদককে তাঁর লেখক ও সম্পাদক দ্বৈতসত্তাকেই উৎসাহ দিচ্ছেন। সমালোচকের সমালোচনা অগ্রাহ্য করে সম্মুখপানে চলার দৃঢ়তা দেখাতে পথনির্দেশ করছেন। আবার লেখক সম্পর্কেও মতামত দিচ্ছেন। যেমন ১৩২১ আশ্বিনের 'সবুজ পত্র'এর লেখক সম্পর্কে বলেছেন,

"র..র লেখাটি যাকে বলে "সারবান"। নিন্দা করাও শক্ত, হজম করাও তাই। এ সব লেখা ভোগ করবার যোগ্য নয় অথচ জমিয়ে রাখার যোগ্য। পত্রপুটে ফুল রাখা চলে, মিষ্টান্ন রাখাও চলে, কিন্তু খনিজপদার্থের ভার ত তার উপরে সয় না — সবুজ পত্র পুটের পক্ষে এই প্রত্নতত্ত্ব রত্নবিশেষ হলেও বেশি গুরুতর হয়েছে। ম..কুমার লোকটি কে তার ত ঠিকানা পাওয়া গেল না। লেখাটি সম্পূর্ণ মাঝারি রকমের। তাপও নেই শৈত্যও নেই। ভাষার বেগ নেই, ভাবের প্রভাব নেই অথচ একটা গতি আছে-এই পর্যন্ত।"[১৫]

এই 'র' হলেন রমাপ্রসাদ চন্দ, তাঁর লেখা 'উত্তরাপথে রাষ্ট্রীয় ঐক্য' এবং ম অর্থাৎ মতীতোষকুমার চৌধুরীর 'সাহিত্যে অভিজাত্য' প্রবন্ধদুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত জানিয়েছিলেন। এর আগে-পরেও এভাবে তিনি লেখা সম্পর্কে, পত্রিকা সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের ভ্রমণকাহিনি কেমন হয়েছে মতামত দিয়েছেন। ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখক হিসেবে পেতে চেষ্টা করেছেন। 'গোবর গণেশের গবেষণা'র লেখককে 'সবুজ পত্র'এ পাওয়া যায় কিনা আলোচনা করছেন। এরকম অসংখ্য 'সবুজ পত্র' কেন্দ্রিক চিন্তার পূর্বাপর নিদর্শন তাঁর চিঠিপত্রে আছে। 'সবুজ পত্র'এর গতি আনতে তাঁর সদর্থক এই ভূমিকা থেকেই তো নিন্দুকদের বক্তব্য ছিল — তিনি সবুজতন্ত্রের পুরোহিত।

দ্বিতীয় বর্ষের সবুজ পত্র ও রবীন্দ্রনাথ

১৩২২ বঙ্গাব্দ, 'সবুজ পত্র'এর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম এগারোটি সংখ্যা জুড়েই ছিল তাঁর উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'। সবুজ পাতার ডাকে সাড়া দিয়ে চলিত ভাষায় লেখা প্রথম রবীন্দ্র-উপন্যাস। উপন্যাসটিতে নিখিলেশ-বিমলা-সন্দীপের উত্তমপুরুষ বাচন আর পরিবর্তিত সৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ভাষা-ব্যবহার নিয়ে এসময়ও রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের পর্যবেক্ষণ যথাযথ —

"ঘরে বাইরে প্রথমে সাধুভাষায় শুরু করলেও 'ডায়ারি-জাতীয় লেখা বলেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে দ্বিতীয় চিন্তায় চলিত রীতি গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলিত রীতি গ্রহণে তিনি যে এখনও দ্বিধাগ্রস্ত, তার প্রমাণ 'সোনার কাঠি [সবুজ পত্র, জৈষ্ঠ্য] প্রবন্ধটি চলিত ভাষায় লেখার পর 'ছবির অঙ্গ'। [ঐ, আষাঢ়], কৃপণতা [ঐ, ভাদ্র-আশ্বিনা] শরৎ[ঐ] প্রভৃতি প্রবন্ধ তিনি সাধু ভাষাতেই লিখেছেন। 'সোনার কাঠি'ও ভাষণ-জাতীয় প্রবন্ধ বলে মনে করার কারণ আছে।"[১৬]

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'বলাকা' পর্বের দুটি লেখা 'আমার গান' আর 'তুমি আমি' নামে প্রকাশিত হয়। জনৈক কলেজ ছাত্রের চারদিনের ডায়ারির ভূমিকা-স্বরূপ একটি লেখাও এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যায় 'কবির কৈফিয়ত' প্রকাশিত হয়, যা পরে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থানুর্ভুক্ত হয়। দুঃখের বিপরীতে কবিদের আনন্দকে প্রকাশ করার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সমালোচকদের উত্তরও এই প্রবন্ধে দেন। 'সোনার কাঠি' প্রবন্ধটিও সাহিত্যে বিদেশি প্রভাবের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় হিন্দু সঙ্গীতের সর্বনাশ করেছেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্যর বিপরীতে এই লেখার শেষে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব মত রাখেন। প্রসঙ্গত এই সংখ্যায় স্বয়ং সম্পাদক এই বিষয়টি নিয়ে কলম ধরেছিলেন। রথীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় শিল্পীদের কথা ভেবে যে বিচিত্রা ক্লাব (The Bichitra Studio for Artist of new Bengal School) স্থাপন করা হয়, গগনেন্দ্রনাথের বাড়িতে তার উদ্বোধনী সভায় শিল্প সম্পর্কে (মূলত চিত্রশিল্প, কাব্যশিল্পের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায়) যে প্রবন্ধ পড়েন আষাঢ় সংখ্যায় 'ছবির অঙ্গ' নামে তা 'সবুজ পত্র'এ প্রকাশিত হয়। 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' নামে একটি গান আর 'যৌবনের পত্র' নামে একটি কবিতাও এই সংখ্যায় রবীন্দ্র-অবদান। কবিতাটি 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থেই জায়গা নেয়। শ্রাবণ সংখ্যায় 'যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি' কবিতাটিও 'বলাকা'র অংশ হয়। এছাড়াও নবসংযোজিত টীকাটিপ্পনীতে রবীন্দ্রনাথের দুখানি লেখা আছে।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি লেখা। আর অন্যটি দেশের শিক্ষার অবস্থা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ই.আর ওয়াটসনের কটাক্ষের প্রেক্ষিতে তাঁর মতামত।

'বলাকা'ভুক্ত 'অজানা' কবিতাটি ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশের কাজে প্রথমে টাকা দিতে না চাওয়ার মূল খুঁজেছেন 'কৃপণতা' প্রবন্ধে। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পট এই লেখাতে স্পষ্ট হয়েছে। 'শরৎ' প্রবন্ধটি তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে যে গীতলতা আছে সেই ভঙ্গিতে লেখা। 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টিতে স্ত্রীশিক্ষা কেমন হওয়া উচিত তা ব্যাখ্যা করেছেন। কার্তিক সংখ্যায় 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' নামে 'বলাকা'র 'নাম' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত কাশ্মীরে ঝিলমনদীর উপর বোটে বসে থাকার সময় হংসবলাকার উড়ে যাওয়ার ঘটনা তাঁর মনে এই কবিতা লেখার প্রেরণা হয়। অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'নূতন বসন' কবিতাটি 'বলাকা' পর্বের মেজাজকেই ধরেছে, পরে তাই 'বলাকা'য় স্থান পায়। টীকাটিপ্পনী অংশে 'ঘরে বাইরে' নিয়ে ওঠা বেশকিছু প্রশ্ন-বিতর্কের উত্তর দিয়েছেন লেখক। পৌষের 'সবুজ পত্র'এ 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতে ধরা পড়েছে সমকালের শিক্ষা ব্যবস্থার ছবি। স্বদেশের এবং স্বভাষার শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা দীর্ঘ রচনাটির অবলম্বন। শেক্সপিয়ারের মৃত্যুর তিনশো বছর পরের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষ্যে লেখা 'শেকসপীয়ার' কবিতাটি এই সংখ্যাতে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষায় শিক্ষার যে প্রস্তাব দেন সেই বিষয়টি কার্যকর করার ভাবনা নিয়ে এই সংখ্যাতেই কলম ধরেছিলেন স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। পরের মাঘ সংখ্যায় এ বিষয়ে লেখেন স্বয়ং বীরবল।

'ফাল্গুনী' নাটকের অভিনয়ের জন্যে বৈরাগ্য সাধন বলে একটি ভূমিকা লেখেন রবীন্দ্রনাথ, যা পরে মাঘের 'সবুজ পত্র'এ স্থান পায়। ফাল্গুনের 'সবুজ পত্র'এ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের শেষ পর্ব লেখা হলো। এর সঙ্গে প্রকাশিত হলো 'রূপ' আর 'চেয়ে দেখা' বলে দুটি কবিতা যে দুটি পরে 'বলাকা'তে স্থান পায়। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেনের সংঘাতের ঘটনা, যার জেরে সুভাষচন্দ্র-সহ তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়, এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'ছাত্র শাসনতন্ত্র' যা চৈত্র 'সবুজ পত্র'এ বের হয়। ছাত্রদের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে কবির কলম মুখর হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত এর ইংরেজি ভাষ্যও লিখেছিলেন তিনি, যা 'দি মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় 'ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস অ্যান্ড ওয়েষ্টার্ণ টিচারস' নামে বের হয়। কবির 'যে কথা বলিতে চাই', নামের একটি কবিতাও এই সংখ্যায় বের হয়। সুবোধ চট্টোপাধ্যায়ের 'ছাত্রের পত্র' এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, যা মূলত রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধদুটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া। ছাত্রদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর কলম মুখর হয়ে ওঠে।

বছরশেষের সালতামামি করলে দেখা যায় যে, এ বছরও 'সবুজ পত্র' রবীন্দ্র-প্রভায় প্রভাবিত। এবছরও অনেকগুলি কবিতা 'সবুজ পত্র'এ লেখেন যা পরে 'বলাকা'তে স্থান পায়। বলাই বাহুল্য, 'বলাকা' পর্বের কবিতাগুলি অবশ্য রূপের দিক থেকে সবগুলি মুক্তক নয়। অনেকগুলি প্রবন্ধও লিখেছেন যে গুলিতে ছবি, গান, শিক্ষা-সহ সমকালীন সামাজিক প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হবার পর ছোট-বড়ো রবীন্দ্র-সমালোচকদের প্রচুর কটূক্তি-কুভাষ শোনা যায়। 'ঘরে বাইরে' অশ্লীল, অনৈতিক, ধর্মদ্বেষী, সমাজদ্বেষী, দেশ-বিদ্বেষী — এসব বিশেষণ উপন্যাস সম্পর্কে দেখা যায়।

সবুজ পত্র ১৩২৩-১৩২৪ ও রবীন্দ্রনাথ

বছরের প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল 'নববর্ষের আশীর্বাদ' কবিতা। সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন, এ কবিতা নয় প্রহেলিকা। ১৮ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ তোসা-মারু জাহাজে চড়ে বিদেশভ্রমণে যান। প্রথম সংখ্যা থেকেই সেই ভ্রমণাভিজ্ঞতা 'সবুজ পত্র'এ বের হতে থাকে। বৈশাখ থেকে ভাদ্র 'জাপান যাত্রীর পত্র' নামে, আশ্বিন ও কার্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'জাপানের পত্র' নামে এবং বৈশাখ, ১৩২৪ এ 'জাপানের কথা' নামে বের হয়। এই ভ্রমণ-বিবরণী সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন, "আমার এ লেখা ধারাবাহিক চিঠি-প্রবন্ধ না। যা যখন মনে আসচে লিখে যাচ্চি একবার Revise করবারও চেষ্টা করিনি। এর মধ্যে আমাদের যাত্রার ছবি কখন কতখানি পরবে বলতে পারিনে কতকগুলি খাপছাড়া প্যারাগ্রাফের মতো হবে। তাতে কি ক্ষতি আছে।"[১৭]

লেখাগুলি পরে 'জাপান যাত্রী' গ্রন্থে (১৩২৬) পরিমার্জনা-সহ স্থান পায়। এ বছর (১৩২৩বঙ্গাব্দ) 'সবুজ পত্র'এ এই ভ্রমণবিবরণ ছাড়া তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর কোনো লেখা ছিল না। প্রথম সংখ্যায় তাঁর

প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠি ছাপা হয়। চিঠিটি বলা যেতে পারে দু'বছরের শেষে রবীন্দ্রনাথের 'সবুজ পত্র' সম্পর্কে অনুভবের প্রকাশ। ভবিষ্যতের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে এও একরকমের 'নববর্ষের আশীর্বাদ' আর শেষ সংখ্যায় 'ভাষার কথা' প্রবন্ধ বের হয়। বাংলাসাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'সবুজ পত্র'এর যে প্রয়াস তাকে স্বীকৃতি দিয়ে তিনিও লেখেন, 'প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবনস্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্যে আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূর পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে।' (৩য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, পৃ. ৭২৫)

প্রসঙ্গত, পরের বছর বৈশাখে এই লেখার সমালোচনা করে নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 'ভাষার কথা' লেখাটি 'সবুজ পত্র'এ বের হয়। এবং এই সংখ্যাতেই তার উত্তর দেন স্বয়ং সম্পাদক। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ সারা বছরটাই প্রায় বিদেশে ছিলেন। তাই প্রমথ চৌধুরী স্পষ্টই লিখেছেন, তিনি কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করছিলেন কারণ রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত কাগজ চালাতে পারবেন এ ভরসা তাঁর ছিল না। কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছামত এই পত্র বাঁচিয়ে রাখতে তিনি প্রতিশ্রুত হন। এই লেখাতে স্পষ্ট বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে ফিরেছেন যখন 'সবুজ পত্র'এর অকাল মৃত্যুর বিশেষ সম্ভাবনা নেই এবং তারিখের শাসন না মানতে পারলেও মাসের শাসন সম্ভবত লঙ্ঘিত হবে না। (সম্পাদকের কৈফিয়ৎ, বৈশাখ, ১৩২৪) অর্থাৎ 'সবুজ পত্র' কতটা রবীন্দ্রনাথ-নির্ভর ছিল তার খোলাখুলি স্বীকারোক্তি দিতেও সম্পাদকপক্ষ পিছপা ছিলেন না। প্রসঙ্গত ৩১ চৈত্র, ১৩২৩এ রবীন্দ্রনাথের প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে পত্র লেখকের অবসাদের এক সুর শোনা যায়। কিন্তু একমাস পরেই (৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪) চিঠিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন লম্বা সাধু ছন্দের 'পরমায়ু' কবিতা যে প্রসঙ্গে আসছি।

১৩২৪ বঙ্গাব্দে বরং 'সবুজ পত্র'এর পাতায় গল্পকার রবীন্দ্রনাথকে বহুদিন পর পাওয়া গেল। কবি রবীন্দ্রনাথও গত বৈশাখের পর আবার এই জ্যৈষ্ঠতে 'সবুজ পত্র'এর পাঠকদের দেখা দিলেন। 'বলাকা' গ্রন্থ বের হয়ে গেছে, আগের 'সবুজ পত্র'এর কবিতাগুলি সঙ্গতভাবেই সেখানে স্থান পেয়েছে। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'পরমায়ু' কবিতাটি বের হয়, যা পরে 'পলাতকা' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। 'পলাতকা'র 'শেষ গান' নামে এই কবিতাটির পরিমার্জিত রূপ 'পূরবী'র 'নাম' কবিতা, তা রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন। 'তপস্বিনী' গল্পটিও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বের হয়। গল্পের মধ্যে ধর্মান্ধতার প্রতি ব্যঙ্গও ঝলসে ওঠে, সমাপনে সেটি প্রখর হয়। আষাঢ় সংখ্যায় বের হয় 'পয়লা নম্বর' গল্প, যেখানে আরেক স্বতন্ত্র নারী অনিলার দেখা পাই। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ পত্রিকায় যে অংশগুলি বাহুল্য মনে করেছেন, গ্রন্থে সেগুলিকে সযত্নে পরিমার্জন করে ছোটোগল্পটিকে আরো সুডোল, নিটোল করে তুলেছেন বলাই বাহুল্য। শ্রাবণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের পুরোনো দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়। 'ছবি ও গান' (১৮৯০ সালের ২১ মে লেখা চিঠিতে) এবং 'মেঘদূত' (১৮৯০ সালের ২৪ মে লেখা চিঠিতে) কী অবস্থায় ও কী মনোভাব থেকে লিখিত চিঠিদুটিতে তার পরিচয় আছে। সম্পাদক স্বয়ং চিঠিদুটি প্রকাশের আগে একটি প্রস্তাবনা লিখেছেন। প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত সংঘের উদ্যোগে রামমোহন লাইব্রেরি হলে কবি 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামে প্রবন্ধ পড়েন তা পরে ভাদ্র সংখ্যায় 'সবুজ পত্র'এ স্থান পায়। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার একটা ধারাও 'সবুজ পত্র'এ চলছিল। এ সংখ্যায় 'পঞ্চক' শিরোনামে 'অচলায়তন' নাটকটির আলোচনা করেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। আশ্বিন ও কার্তিক যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'আমার ধর্ম'। এটি বিচিত্রা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যথাক্রমে ১৭ আশ্বিন ও ২০ আশ্বিন রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও 'সবুজ পত্র' হিন্দুধর্মের দ্বেষক এটি প্রমাণ করতে রবীন্দ্র-সমালোচকরা আদা-জল খেয়ে লেগেছিলেন। তাঁর গল্পগুলি, উপন্যাস এমনকি জাপানযাত্রার বিবরণের মধ্যেও তাঁরা হিন্দুধর্মের অপমান দেখতে পান। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমত বিষয়ে বিরোধীদের উত্তরেই তাঁর এই প্রবন্ধ। স্বরচিত রচনা থেকে উদ্ধরণ করে এ তাঁর ধর্ম সম্পর্কে আত্মদর্শন। অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন সংখ্যাও রবীন্দ্ররচনা থেকে বঞ্চিত। তবে পৌষ আর মাঘ পরপর দুইসংখ্যায় পায় যথাক্রমে গল্প 'পাত্রপাত্রী' আর রূপক গল্প 'তোতাকাহিনী'। শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রভাবনার প্রতিফলন যেমন দ্বিতীয় রচনায় আছে, তেমনি অন্যধরণের রবীন্দ্রগল্পের পথিকৃৎ 'তোতাকাহিনী'। প্রসঙ্গত পৌষসংখ্যায় 'ঘরে বাইরে'র প্রসঙ্গ নিয়ে সমালোচকদের সমালোচনা লেখেন অরবিন্দ সেন। ছন্দ নিয়ে দীর্ঘদিন পর দীর্ঘ আলোচনা করেন চৈত্র সংখ্যায় যা 'ছন্দ' নামে প্রকাশিত হয়।

১৩২৩ এর চেয়ে ১৩২৪এ একটু বেশি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। বারবার জোর দিয়েছেন নতুন লেখক তৈরির দিকে সম্পাদকের দৃষ্টিপাতের জন্যে। তবে 'সবুজ পত্র' যে জমে উঠছে সে বিষয়ে আশাপ্রকাশ করেছেন শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ। অতুলচন্দ্র ও বরদাচরণ দুই গুপ্ত সন্তান যে 'সবুজ পত্র'এর সম্পদ, সে বিষয়েও উচ্ছ্বসিত ছিলেন তিনি। ২৩ কার্তিক, ১৩২৪ সালে সম্পাদককে লেখা চিঠিতে তাঁর এই মত পাওয়া যায়। পাশাপাশি তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচকও। এর তিনদিন পর লেখা আরেকটি চিঠিতে

বানানভুল নিয়ে কড়া কথা লেখেন, যদিও সমাধান-সূত্রও সেইসঙ্গে দিয়েছেন। তাঁর সমালোচকরা অবশ্য 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'অর্চনা', 'নব্যভারত' এইসব পত্রিকায় সমালোচনা দ্বিগুণ করলেন যা অনেকক্ষেত্রেই অর্থহীন, অযৌক্তিক অথচ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ।

পঞ্চম বর্ষীয় সবুজপত্র এবং রবীন্দ্রনাথ

'মুক্তি' কবিতা দিয়ে শুরু হলো ১৩২৫এর 'সবুজ পত্র'এর কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রা। মুক্তক ছন্দে গাঁথা আখ্যান কবিতা। রাঁচি থেকে ১০/১১/১৭ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর একটি চিঠি এই সংখ্যায় স্থান পায়। 'নববিদ্যালয়' নামে লেখাটিতে শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে প্রমথর মতামত আশ্রমের শিক্ষা ব্যবস্থাকেই সমর্থন করে। এই বৈশাখ সংখ্যায় 'গুরু' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি পুরোনো চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিদুটির প্রকাশের কারণ এই — ফরাসি ভাষায় গার্ডেনারের সমালোচনা করেন ফরাসী লেখক Louis Chadourne সমালোচনা সুন্দর হলেও তিনি একজায়গায় লেখেন, 'রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কবিতার ভিতর despair এবং resignation এর সুর আদপেই নেই।' প্রমথ চৌধুরী সাতাশ বছর আগে 'মানসী' পড়ে একটি চিঠিতে তাঁর পাঠ-প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছিলেন, 'মানসী'তে একটা despair এবং resignation এর সুর আছে। তার উত্তরে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠি, যা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'ছিন্নপত্র' বলে মুক্তকে লেখা একটি দীর্ঘ আখ্যান কবিতা এই সংখ্যায় স্থান পায়। 'মুক্তি'র মতো এটিও পরে 'পলাতকা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আষাঢ়ের জন্যে 'কালো মেয়ে' কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। 'পলাতকা' গোত্রের এই কবিতাটিতে বাঁশির সুরে মেসের দরিদ্র ছেলে আর কালো মেয়ে নন্দরাণীর মধ্যে অসীম ব্যবধান মিলিয়ে যেতো। রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার সুর এই কবিতাটিরও অবলম্বন। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে 'নববিদ্যালয়' নামে শিক্ষাভাবনার আরেকটি লেখা এই সংখ্যায় লেখেন। পঞ্চম বছরে এরপর রবীন্দ্রনাথের লেখা 'সবুজ পত্র'এ আর নেই বললেই চলে। একমাত্র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'স্বর্গ-মর্ত্য' নাটিকা, যা পরে 'লিপিকা'তে স্থান পায়। 'লিপিকা'র লেখাগুলির গোত্রবিচার এককথায় সম্ভব নয়, কাজেই কর্মফল গল্পের কথা মাথায় রেখে কেউ যদি কেন নাটিকা বলব প্রশ্ন তোলেন সে প্রশ্ন সঙ্গত।

প্রসঙ্গত, আশ্বিন সংখ্যায় ৩৪ বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চন্দ্রনাথ বসুর দুটি চিঠি প্রকাশিত হয়, যা থেকে 'সেকালে কি ভাবে সাহিত্য আলোচনা করা হত তার পরিচয় পাওয়া' যায়। এই সংখ্যাতেই প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে নববিদ্যালয় (ভাষা শিক্ষা) আলোচনা করেন। বছরের শেষে সম্পাদক 'সবুজ পত্র'কে অন্তত আর একবছরের জন্যে বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প করেন। সেখানে টাকার অভাবের পাশাপাশি লেখার অভাবের কথাও বলা হয়। নাম না করলেও সকলেই জানেন, 'সবুজ পত্র'এর প্রাণ তখনো রবীন্দ্রনাথ, তাঁর লেখার অভাব 'সবুজ পত্র'এর নাভিশ্বাস ওঠার অন্যতম কারণ বৈকি।

১৩২৬-১৩২৮-২৯: রবিশস্য আর সবুজ পাতা

১৩২৬এ কিন্তু জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ আর মাঘ এই পাঁচ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা না থাকলেও বাকি ছয়টি সংখ্যায় (ফাল্গুন ও চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা) তাঁর লেখা আছে। ১৩২৬এর বৈশাখ সংখ্যার প্রথম লেখাটি একটি গান, তাৎপর্যময় গানটির প্রথম দুই পঙক্তি হলো,

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

১৭ বৈশাখ, ১৩২৬এ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিটি যা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাও 'সবুজ পত্র'কে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়ে লেখা: " 'সবুজ পত্র'কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বই কি। দেশের তরুণদের মনে সবুজ রংকে বেশ পাকা করে দেবার পূর্ব্বে তোমার ত নিষ্কৃতি নেই — প্রবীণতার বর্ণহীন রসহীন চাঞ্চল্যহীন পবিত্র মরুভূমির মাঝে মাঝে অন্তত একটা আধটা এমন ওয়েসিস থাকা চাই যাকে সর্ব্বব্যাপী জ্যাঠামির মারী-হাওয়াতেও মেরে ফেলতে না পারে। অন্তহীন বালুকারাশির মধ্যে তোমার নিত্যমুখর 'সবুজ পত্র'এর দোদুল্যমান ছায়াটুকু যৌবনের চির-উৎস ধারার পাশে অক্ষয় হয়ে থাক।" (৬ষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৩)

প্রসঙ্গত এই চিঠির উত্তরে প্রমথ চৌধুরীর লেখা ২০ বৈশাখ লেখা চিঠিটিও 'খোলা চিঠি' নামে এই সংখ্যাতেই

রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গেই প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো 'মুক্তির ইতিহাস' যা পরে লিপিকাতে 'ঘোড়া' নামে স্থান পায়। ১৯১৮র মন্টেগু-চেমসফোর্ড বা মন্টফোর্ডের ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়া এবং রাউলাট কমিটির রিপোর্টের মধ্যে ভারতবাসীর উপর যে অবিচার ছিল তার প্রতিবাদে লেখা এই রচনাটি রাজনৈতিক-ব্যঙ্গ, রূপক, প্যারাবল-ফেবল সব লক্ষণ নিয়েও নিটোল একটি গল্প। অন্যরকম গল্প। আষাঢ় সংখ্যায় একটি ও শ্রাবণ সংখ্যায় দুটি কথিকা প্রকাশিত হয়। কথানু না বলে কথিকা নামটি লেখক নিজেই পছন্দ করতেন। বিকল্প নাম ছিল গল্পস্বল্প।[১৮] পরবর্তীতে আষাঢ়ের কথিকাটির নাম হয় 'প্রথম শোক' শ্রাবণের কথিকাদুটির নাম হয় যথাক্রমে 'অস্পষ্ট ও বাণী'। ভারতীর 'পুষ্পাঞ্জলি' (বৈশাখ, ১২৯২) রচনার ভাব ও ভাষা কোনো কোনো কথিকাগুলির মধ্যে আছে। গদ্যের সীমারেখা ছুঁতে ছুঁতে গীতিগদ্য হয়ে ওঠা লেখাগুলি 'পুনশ্চ'র পূর্ব-ধাপ। পরকর্তীকালে 'পুনশ্চ'এর (১৯৩২) ভূমিকায় তাঁর স্বীকারোক্তি স্মরণীয় — 'গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণিতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে প্রশ্ন ছিল যে, গদ্য ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজির মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।... আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপাবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি, ভীরুতাই তার কারণ।'

কার্তিকের 'বাঁশি' আর অগ্রহায়ণের কথিকাটি (পরে নাম হয় 'গলি') এই শ্রেণির রচনা। ফাল্গুন ও চৈত্র যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'আমার কথা', যা পরে 'প্রাণমন' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। রচনাটিতে গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়, ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ঢঙ হলেও। মাঘ সংখ্যায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য' বলে একটি প্রবন্ধ বের হলেও ১৩২৭ সালের সবুজ পাতা রবীন্দ্র-রচনাবিহীন থেকে যায়। অবশ্য এ বছর অধিকাংশ সময়টাই তিনি বিদেশে ছিলেন এবং সামগ্রিকভাবেও তাঁর রচনাও এবছর উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

১৩২৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হলেও সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা ছিল না। আষাঢ়স্য শেষ দিবসেই অবশ্য রবীন্দ্রনাথ দেশেও ফেরেন। কিন্তু ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'পট' গল্পটি যা পরে 'লিপিকা'ভুক্ত হয়। এর আগে 'তোতাকাহিনী' বা 'মুক্তির ইতিহাস'এ সমকালের শিক্ষাব্যবস্থা বা রাজনীতি রূপকের আড়ালে ঝলসে উঠলেও 'পট' অন্যস্বাদের গল্প। রূপকথার আদলটুকু হয়তো আছে কিন্তু রূপের দিক দিয়ে 'লিপিকা'র গল্পগুলি যেমন তেমনি, লেখকের ভাষায় গল্পস্বল্প বা কথানু। এছাড়া 'আমাদের সঙ্গীত' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হয়, এটি ৫ ভাদ্র যুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে সংগীত সংঘের পক্ষ থেকে কবি-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে কথিত হয়। এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষার মিলন' লেখাটিও পূর্বপঠিত, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কবি-সংবর্ধনা সভায়। প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধের সমালোচনা করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'নারায়ণ'এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখেন 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংবর্ধনা সভায় তাঁর মৌখিক ভাষণটি অভিভাষণ নামে মুদ্রিত হয়। মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় 'সিন্ধি' গল্পটি প্রকাশিত হয়। 'লিপিকা' পর্বের এই গল্পটি। এছাড়াও রবীন্দ্রময় 'সবুজ পত্র'এর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রবীন্দ্রনাথের 'দি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ান কালচার' নামক গ্রন্থের অনুবাদ ভারতে 'শিক্ষার আদর্শ' নামে আশ্বিন কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় বের হয়, অনুবাদক ছিলেন অমূল্যরতন প্রামানিক। মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যাতেই 'গীতাঞ্জলি' ও 'সত্য কবিতা' নামে প্রমথ চৌধুরী একটি লেখায় 'অলকা'তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-সমালোচনার জবাব দেন। ১৩২৮এর চৈত্র আর ১৩২৯এর বৈশাখ যুগ্মসংখ্যা প্রকাশিত হয়। বহুদিন পর (আষাঢ় ১৩২৫এর পর) 'সবুজ পত্র'এ রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রকাশিত হয়, 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটি, যা পরে 'পূরবী'তে স্থান পায়। অমূল্যরতন প্রামাণিক রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশানলিজম ইন জাপান' শীর্ষক প্রবন্ধটি জাপানের জাতীয়তা নামে অনুবাদ করে এই সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এরপর আরেকটি সংখ্যা বের হয়েই 'সবুজ পত্র' কয়েকবছরের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।

১৩৩২-১৩৩৪: পাতা ঝরার দিনগুলিতে রবীন্দ্রনাথ

তিনবছর পর আবার 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হলো ১৩৩২ বঙ্গাব্দের ভাদ্রতে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনাপর্বেই রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন, "সবুজ পত্র বের করতে চাচ্চ কিন্তু রস জুগিয়ে পত্রোদগমের সহায়তা করতে পারি আজকাল আমার মধ্যে শক্তির তেমন দাক্ষিণ্য নেই। মুস্কিল এই, তুমি স্বয়ং ছাড়া লেখবার লোক কেউ নেই।"[১৯] নতুন লেখকের সমস্যার কথা রবীন্দ্রনাথ আগেও অনেকবার বলেছিলেন, এখনো সেই আশঙ্কা করেছেন। নিজের অপারগতার কথা বললেও ভাদ্রসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'চরকা' প্রবন্ধটি, যা পরে 'কালান্তর'এ প্রকাশিত হয়। মহাত্মাজী তাঁর কাছে অভিমত দাবী করেছিলেন এবং তাই দ্রুত

তিনি এটা লিখেছেন, 'সবুজ পত্র'এর পুনরুদগমের দেরি থাকলে অন্য কোথাও দেবেন এমনটাই এই লেখা সম্পর্কে ৬ জুলাই, ১৯২৫ তারিখে সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর পথ আর রবীন্দ্রনাথের পথ যে এক নয়, চরকা কাটার পথ যে তাঁর কাম্য হতে পারে না এ প্রবন্ধে স্পষ্ট করে দিয়েছেন লেখক। এছাড়া 'অতীত', 'প্রভাতী' আর 'একদা' নামে তিনটি কবিতা এ সংখ্যার আকর্ষণ, তিনটি কবিতাই পরে 'পূরবী'গ্রন্থে সংকলিত হয়। আশ্বিনের 'সবুজ পত্র'এ বের হয় 'স্বরাজ সাধন' প্রবন্ধটি, এটিও 'কালান্তর'ভুক্ত হয়। কার্তিকে 'শেষ বর্ষণ' গীতিনাট্যটি মুদ্রিত হয়। পৌষসংখ্যায় বের হয় দলবৃত্তে লেখা একটি কবিতা 'নাতনির উদ্দেশে'। 'সকালবেলার কুঁড়ি আমার'এই নামে একটি গানও এইসংখ্যার সম্পদ। চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'দোলপূর্ণিমায়' নামে দুটি গান, 'দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা' আর 'ফাগুনের নবীন আনন্দে'। এছাড়া ২৫ মাঘ, ১৩৩২এর সন্ধ্যায় পূর্ববাংলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে লীলানাগ প্রতিষ্ঠিত দীপালি সংঘের অনুষ্ঠানে যে ভাষণ দেন তা এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। প্রসঙ্গত এই পর্বে প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রসাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ পাই। একটি পদ্মা ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে (ফাল্গুন, ১৩৩২) আর অপরটি 'সোনার তরী' নিয়ে (বৈশাখ, ১৩৩৩) আলোচনা। প্রমথনাথ বিশীর 'চিত্রা' ও 'চৈতালি'র অলোচনাও আষাঢ়, ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৩ এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দিল্লি শহরে 'ফাল্গুনী' অভিনয়ের বিষয়ে অবনীথনাথ রায়, বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর সত্যচরণ সরকারের তিনটি রচনা প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে ফ্রান্সের একটি সংবাদপত্রে (Les Novellcs Litteraires) প্রকাশিত 'ফাল্গুনী'র আলোচনার অনুবাদ করে প্রমথ চৌধুরী এই সংখ্যায় প্রকাশ করেন। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠতে রবীন্দ্রনাথের কোনো লেখা প্রকাশিত না হলেও আষাঢ়ে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র উত্তরে রবীন্দ্রনাথের পাঠ-প্রতিক্রিয়াজাত একটি চিঠি (এটি প্রথমে একটু পরিবর্তিত আকারে 'ভারতী'তে ছাপা হয়। ভারতীতে লেখাটি দেবার জন্যে প্রমথ চৌধুরীকে অনুরোধ করে নিরুপায় রবীন্দ্রনাথ ১৮ বৈশাখ, ১৩৩৩এ একটি চিঠি লেখেন) এবং তার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর টীকা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে বিখ্যাত কবিতাটি ('আমি ত' ছিলাম ঘুমে') এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৩এ রবীন্দ্ররচনা সবুজ পাতায় খুব কম। তিনটি চিঠি আর পাঁচটি গান এই হলো এবছরের রবীন্দ্ররচনা। আশ্বিনে তাঁর একটি পত্র বের হয়। 'ভারতী' সম্পাদিকার সঙ্গে 'প্রবাসী' সম্পাদকের বিরোধে রবীন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে (পত্র-তারিখ ২০ জুলাই, ১৯২৬) তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। চিঠিটিতে 'প্রবাসী' সম্পাদককে কৃতজ্ঞতা বা 'ভারতী' সম্পাদিকাকে কর্তব্যজনিত তিরস্কার যেমন আছে, তেমনি কোথাও অভিমান বা ক্ষোভের সুরটুকুও কান এড়ায় না। চিঠিটি ছাপানোর জন্যে প্রমথ চৌধুরীকে একরকম অনুরোধ করেন, ২১ জুলাই, ১৯২৬এর চিঠিতে। আত্মীয়তার চেয়ে ন্যায়বিচারের দায়িত্ব বড় সে কথা ভোলেননি রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদককেও তা মনে করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি অপারগ হলে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। এইসব ছোটো ছোটো ঘটনায় মহামানব রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি গান 'গীত-পঞ্চক' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যা ও পরের সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ' নামে দিলীপকুমার রায়ের দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। মাঘ সংখ্যায় দিল্লিতে 'ডাকঘর' নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে অবনীনাথ রায় আলোচনা করেন (পাঠকদের 'ফাল্গুনী' প্রসঙ্গ মনে পড়বে)। ফাল্গুনে বার্লিন (১১জানুয়ারি, ১৯২৭ এ লেখা) থেকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠির অংশবিশেষ 'সবুজ পত্র'এ বের হয়। ইউরোপের লোকের তৎকালীন মনোভাবের পরিচয় দিতে সম্পাদক এটি প্রকাশ করেন। বৈশাখ ১৩৩৪ সংখ্যায় বের হয় রবীন্দ্রনাথের 'শেষ মধু' কবিতাটি। এরপর আর দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হলেও 'সবুজ পত্র'এর পাতায় এটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখা, আক্ষরিক অর্থেই পাঠকদের কাছে শেষ মধু। প্রমথনাথ বিশী এবং প্রমথ চৌধুরীর রবীন্দ্রনাথ-কেন্দ্রিক দুটি আলোচনা অবশ্য এসময় প্রকাশিত হয়।

সবুজ পত্রপুটে রবি-রশ্মি: শেষ নাহি যে..

রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পেয়েও 'সবুজ পত্র' দীর্ঘস্থায়ী হলো না তার জন্যে ইন্দিরা দেবী মণিলালের বৈষয়িক সুপরিচালনার অভাবকে দায়ী করেছেন।[২০] স্বয়ং সম্পাদক অবশ্য তাঁর আত্মকথায় প্রথম পর্যায়ের বন্ধ-বিপর্যাসের জন্যে যুদ্ধ আর দ্বিতীয় পর্যায়ের বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিলাত চলে গিয়ে খরচা বন্ধ করে দেওয়ার কারণটি দেখিয়েছেন।[২১] রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রমথ চৌধুরীকে প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তির সময় এক চিঠিতে বলেছেন, এতদিন 'সবুজ পত্র' যে চলছিল সেটাই আশ্চর্য।[২২] দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিসমাপ্তির সময় দৈন্যর দায়ে তাঁর 'বিচিত্রা' শরণের অসহায়তার কথা ১২ চৈত্র, ১৩৩৩এর চিঠিতে পাই। তবে দু-দফায় প্রায় একদশক ধরে 'সবুজ পত্র' আর রবীন্দ্রনাথ অঙ্গাঙ্গিভাবে ছিলেন। মণিলাল বলেছিলেন,

রবীন্দ্রনাথের 'সবুজ পত্র'এর লেখার সঙ্গে অন্য লেখার এতো তফাত যে অন্য কোনো কাগজে রবীন্দ্রনাথ লেখা দিলে তার তেমন সমাদর হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ কথা সমর্থন করেন বলেই প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছেন।[২৩] এ কথা সত্য, 'সবুজ পত্র' এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাণের যোগ খুঁজে পেয়েছিলেন 'প্রবাসী' সম্পাদককে লেখা চিঠিতে তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন তা আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি। 'সবুজ পত্র'এর সঙ্গে 'সাহিত্যিক আত্মীয়তা'র কথা রবীন্দ্রনাথ সম্পাদককে সরাসরি বলেছেন। এই পত্রিকার অবদান হিসেবে রবীন্দ্র-গদ্যের উপর এর প্রভাবের কথা আগেই বলেছি। 'সবুজ পত্র' পর্বের রবীন্দ্র-গদ্য যার ব্যাপ্তি ছিল বাকি জীবনকাল ধরে। জনৈক সবুজ পত্রীর মতে,

"সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে যে-পথ নির্দেশ করেছিল, সে পথে রবীন্দ্রনাথ চলেছিলেন প্রমথবাবুর অনুসরণে। এখানে 'পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ' বচনটি সার্থক হয়েছিল।"[২৪]

অবশ্য 'সবুজ পত্র'এর কাছে ঋণস্বীকারের পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে এই ঋণ পারস্পরিক — 'সবুজ পত্র'কেও তিনি তাঁর প্রতিভাকিরণ দুহাতে বিলিয়েছেন। 'সবুজ পত্র'এর রবিশস্যগুলি নিয়ে পরে গড়ে ওঠে কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা', 'পলাতকা', 'পূরবী'র কয়েক কলি। 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস। 'ফাল্গুনী', 'শেষ বর্ষণ' নাটক। অনেকগুলি নানা স্বাদের গল্প। প্রথিতযশা সমালোচক যে গল্পগুলি সম্পর্কে বলেছেন,

"সবুজপত্র পর্বের গল্পভাষার বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিদীপ্ত বক্রোক্তি-সমুজ্জ্বল এপিগ্রাম আর স্মরণীয় সুভাষিতাবলী। ঘটনাবিন্যাসে, চরিত্রায়ণে, সময়ের ঐক্যবিধানে ও শীর্ষমুহূর্ত সৃজনেও আছে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়াস।"[২৫]

পরীক্ষানিরীক্ষা 'লিপিকা'তেও আছে আর 'সবুজ পত্র'এ আছে 'লিপিকা'র ভিন্নরকমের, অন্যস্বাদের গল্পগুলির কয়েকটি। গোত্রবিচারের সংশয় নিয়ে 'লিপিকা'র আরো কয়েকটি রচনা। বহুবিচিত্র বিষয়ের প্রবন্ধ। শিক্ষা থেকে রাজনীতিতে বিষয়মুখ্য বিচরণ আবার বিষয়ীর প্রাধান্যে গড়ে ওঠা রচনাসম্ভার। 'জাপান যাত্রী' গ্রন্থের রচনাসমূহ। এগুলি আমরা ক্যালেন্ডারের চলনে 'সবুজ পত্র' এর বিকশিত হওয়ার দিনগুলি ধরেই দেখেছি। কালের নিয়মে বা বলা ভালো বাংলা সাময়িকপত্রের নিয়মেই 'সবুজ পত্র' দীর্ঘস্থায়ী হলো না। অন্যধরণের পত্রিকা বলেই পাঠক-স্বল্পতার কারণেও এই ক্ষণস্থায়ীত্ব। কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'সবুজ পত্র' স্থায়ী আসন পাবে তার কৃতিত্ব যেমন প্রমথ চৌধুরীর, তেমনই রবীন্দ্রনাথেরও। প্রধান লেখক, সমালোচক, উপদেষ্টা আর শুভানুধ্যায়ী — সেই রবীন্দ্রনাথ — 'সবুজ পত্র'এর রবীন্দ্রনাথ।

তথ্যসূত্র:

১। 'ভূমিকা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, ১৯৪১, পরিবর্ধিত জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ ১৯৭৪, পৃ. ৯

২। 'আত্মকথা', প্রমথ চৌধুরী, মনফকিরা, ২০০৭, পৃ. ৯১-৯২ (অতঃপর 'আত্মকথা' নামে উল্লিখিত)

৩। 'বিকল্প সূত্র', প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৭০

৪। 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ১৮ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, ১৪২২ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ৫, পৃ. ১৭১ (অতঃপর 'চিঠিপত্র ৫' নামে উল্লিখিত)

৫। ওই, ২১ ও ২২ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৭৩-৭৪

৬। ওই, ২২ সংখ্যক পত্র,পৃ. ১৭

৭। ওই, ১৯ সংখ্যক পত্র,পৃ. ১৭২

৮। 'আত্মকথা', পৃ. ১১-৯২

৯। 'চিঠিপত্র', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ৪১ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য, খণ্ড ১২, পৃ. ৪৯ (অতঃপর 'চিঠিপত্র ১২' নামে উল্লিখিত)

১০। 'চিঠিপত্র ৫', পৃ. ১৭৭

১১। ওই, ২৮ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৮২

১২। ওই, ৩৪ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৯০

১৩। ওই, ৩৫ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৯২
১৪। ওই, ২৭ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৮১
১৫। ওই, ৩২ সংখ্যক পত্র, পৃ. ১৮৭
১৬। ‘রবিজীবনী’, প্রশান্তকুমার পাল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ৭, পৃ. ৯৭
১৭। ‘চিঠিপত্র ৫’, পৃ. ২১৩-২১৪
১৮। ওই, ৮০ সংখ্যক পত্র,পৃ. ২৬১
১৯। ওই, ৯৩ সংখ্যক পত্র, পৃ. ২৭৭
২০। ‘স্মৃতিসম্পুট’, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০১৭, ১৯৫৩, খণ্ড ১, পৃ. ১২৯
২১। ‘আত্মকথা’, পৃ. ৯৩-৯৪
২২। ‘চিঠিপত্র ৫’, পৃ. ২৬৭
২৩। ‘আত্মকথা’, পৃ. ১৩
২৪। ‘সবুজ পাতার ডাক’, হারীতকৃষ্ণ দেব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ১৯৯৭, পৃ. ৩০
২৫। ‘রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ’, তপোব্রত ঘোষ, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কালীঘাট পার্ক, কলকাতা ৭০০০২৬, পৃ. ৩২৪

লেখক পরিচিতি : অশোককৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ